

আকাশ কত বড়?

আকাশ দেখতে কার না ভালো লাগে? উপরে তাকালেই যে বিশাল মহাকাশ আমরা দেখি তার শেষ কোথায়? কত বড় এই আকাশ? এই পৃথিবী, আকাশ, মহাবিশ্ব- কোথা থেকে এল এসব? এই সকল প্রশ্নের উত্তরই এবার খুঁজব আমরা!





আকাশের দিকে তাকিয়ে যা যা প্রশ্ন
তোমাদের মনে জাগে এখানে নিখে
রাখো। এই কাজ শেষ হলে মিনিয়ে
দেখে নিও কোন কোন প্রশ্নের উত্তর
থুঁজে পেনে!





প্রথম সেশন

শুরুতেই চল আমাদের মাথার উপরের আকাশটাকে দেখি। আকাশের দিকে তাকালে আমরা কী কী দেখতে পাই? চট করে নিচের ছকে লিখে ফেলো!

দিনের আকাশে কী কী দেখি	রাতের আকাশে কী কী দেখি?
.....
.....
.....
.....
.....

ভোরে আকাশের রঙ যেমন থাকে, দুপুরেও কি তাই? আবার সন্ধ্যার আকাশের কথাই ধরো না কেন! দিনের আকাশ যেমন সকাল দুপুর বিকেলে এত রঙ পাল্টায়, রাতের আকাশ কি তাই? দিন বা রাতের কোন সময়টার আকাশ তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ? তোমার পাশের বন্ধুর সাথে তোমার চিন্তা শেয়ার করো। কোন সময়ের আকাশ ওর সবচেয়ে প্রিয়? দেখো তো এবার ওর প্রিয় আকাশকে তুমি আঁকতে পারো কিনা! চাইলে পোস্টার কাগজে কাগজ কেটে ডিজাইনও করতে পারো!



চলো একে ফেলা যাক!



ছবি: আমার চোখে অন্যের আকাশ

- ✎ আঁকা হয়ে গেলে তোমার বন্ধুকে দেখাও ওর পছন্দ হয় কিনা। ক্লাসের অন্যদের কাজও দেখো। অন্য সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো এটা কোন সময়ের আকাশ বলতে পারে কিনা!
- ✎ বাসায় ফিরে আজ রাতে আকাশটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো! আকাশে এই যে লক্ষ লক্ষ তারা, সবাই কি একই রকম? সবার রঙ কি একই? সবাই কি একইভাবে মিটিমিটি করে জ্বলে?



দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেশন

- ✎ গতরাতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে আকাশের সব তারা একইরকম নয়। সবগুলো একইভাবে মিটিমিটি করে জ্বলে না, এমনকি সবগুলোর রঙও একদম একই রকম নয়, কোনোটা সাদা, কোনোটা হলদেটে, কোনোটা আবার কিছুটা লালচে।
- ✎ তোমার পর্যবেক্ষণের ফল বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেখো তো তারা একমত হয় কিনা!
- ✎ তোমার বন্ধুরাও যদি তোমার মতো ভালো করে লক্ষ করে থাকে তাহলে ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই একমত হয়েছে যে, রাতের আকাশে খালি চোখে আমরা যেসব আলোকবিন্দু জ্বলতে দেখি, যাদের আমরা নাম দিয়েছি ‘তারা’, তারা আসলে সবাই একরকম নয়, এমনকি সবাই সত্যিকার অর্থে ‘তারা’ও নয়। নক্ষত্র বা তারা সেগুলোই- যেগুলো আমরা মিটিমিটি করে জ্বলতে দেখি, এর বাইরেও মহাকাশে যেসব গ্রহ-উপগ্রহ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই সেগুলোর আলো কিন্তু একেবারে স্থির মনে হয়।

- ✎ নক্ষত্রের নিজের আলো আছে, সূর্যও তাই একটি নক্ষত্র। সূর্যকে ঘিরে যে সৌরজগত, তা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু সূর্য ছাড়াও মহাবিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে যার অল্প কয়েকটা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এই নক্ষত্রেরা আবার দল বেঁধে গ্যালাক্সির রূপ নিয়ে একসাথে থাকে। আমাদের গ্যালাক্সির নাম হলো মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথ।
- ✎ আমরা কি আকাশের দিকে তাকালে আমাদের গ্যালাক্সিকে দেখতে পাই? ক্লাসে নিজেরা আলাপ করে দেখো তো কেউ কখনো দেখেছে কিনা?
- ✎ আমাদের ছায়াপথের মতো মহাবিশ্বে আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে, কিন্তু এই সংখ্যাটা কত হতে পারে? আর এই একেকটা গ্যালাক্সিতে মোট কতগুলো নক্ষত্র থাকতে পারে আন্দাজ করো তো? অনেক অনেক নক্ষত্র যখন গ্যালাক্সিতে একসাথে থাকে তাকে কেমন দেখাতে পারে অনুমান করতে পারো? পাশের সহপাঠীর সাথে আলাপ করে দেখো, এবার দুইজন মিলে তোমাদের অনুমান খাতায় লিখে বা ঐঁকে রাখো।

	গ্যালাক্সির সংখ্যা	গ্যালাক্সিতে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা
তোমার অনুমান		

- ✎ এবার দুজন মিলে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ে গ্যালাক্সি সম্পর্কে যা লেখা আছে তা পড়ে জানার চেষ্টা করো, গ্যালাক্সি দেখতে আসলে কেমন হয়? একেকটা গ্যালাক্সিতে সূর্যের মতো কতগুলো নক্ষত্র থাকে? মহাবিশ্বে মোট গ্যালাক্সির সংখ্যা কত হতে পারে? আগে যা লিখে বা ঐঁকে রেখেছিলে বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখো তো তোমাদের অনুমান সঠিক কিনা! যা জানলে তাও ছকে লিখে ফেলো!



	গ্যালাক্সির সংখ্যা	গ্যালাক্সিতে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা
তোমার অনুমান		
বিজ্ঞানীদের অনুমান		

✎ এই যে কল্পনার অতীত বিশাল মহাবিশ্ব, এই সবকিছুর একটা শুরু তো ছিল নিশ্চয়ই? মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে এ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অনেক মাথা ঘামিয়েছে, বিভিন্ন গল্প তৈরি হয়েছে মুখে মুখে। যেমন এককালে কিছু মানুষ বিশ্বাস করতো এই পুরো বিশ্বজগত রাখা আছে চারটা অতিকায় হাতের পিঠে, সেই হাতগুলো আবার দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল কচ্ছপের পিঠে।



✎ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ এই গল্প শুধুই কল্পনা ছাড়া কিছু নয়, এবং এর সপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকে শুধু কাল্পনিক গল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করেনি, বরং এ নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানও খুঁজে বেরিয়েছে। তোমাদের বইয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ‘বিগ ব্যাং’ ব্যাখ্যা করা আছে। একবার তা পড়ে নাও, তারপর একটু চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-

* বিগ ব্যাং তত্ত্ব কি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নাকি তা শুধুই মানুষের কল্পনা?

.....

.....

.....

.....

.....

* এই তত্ত্বের সপক্ষে কি বিজ্ঞানীরা কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

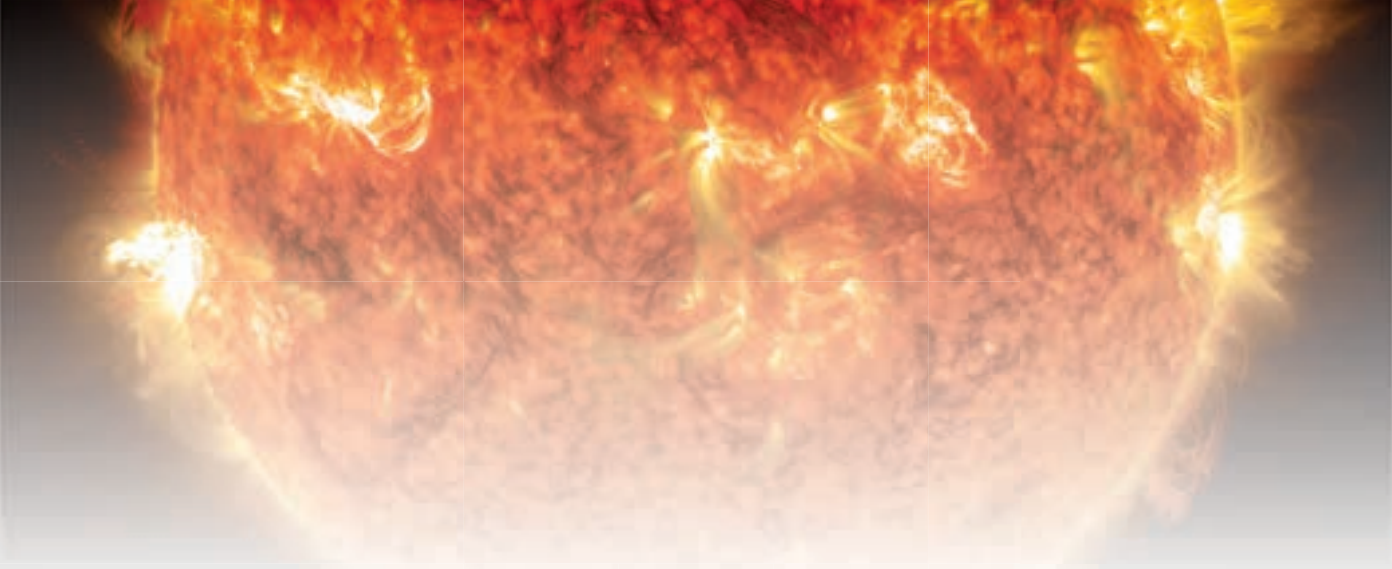
.....

.....

.....

.....

.....



✍ মহাবিশ্বের সৃষ্টির পর নক্ষত্রের জন্ম কী করে হলো তাও তোমরা ইতোমধ্যে জেনেছো নিশ্চয়ই? নক্ষত্রের আলো আছে সেও আমরা আগেই জানি। আমাদের বাসাবাড়িতে অনেক সময় আলো জ্বালাতে আমরা তো মোমবাতি, হারিকেন বা চার্জার লাইট জ্বালাই- জ্বালানি বা ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে একসময় বাতি নিভেও যায়। নক্ষত্রের জ্বালানিও কি এভাবে ফুরিয়ে যেতে পারে? নক্ষত্রের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে তার আসলে কী হয়? দুই মিনিট চিন্তা করো, এরপর আলাপ করে দেখো তো এ বিষয়ে তোমার পাশের সহপাঠী কী মনে করে? এবার নিজেদের ধারণা শিক্ষকের সাথে শেয়ার করো। শিক্ষক যা বলবেন তা এবার বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ে দেখো।

✍ আজ রাতে আবার আকাশের দিকে তাকিও। মহাবিশ্বের শুরু থেকে নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু জানার পর নিশ্চয়ই আকাশের তারাদের আজ নতুন চোখে দেখবে!

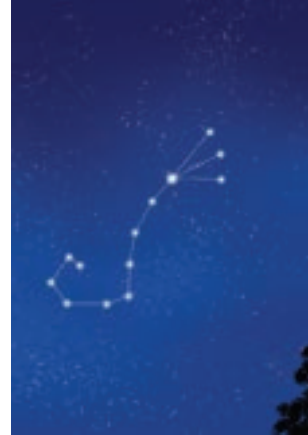
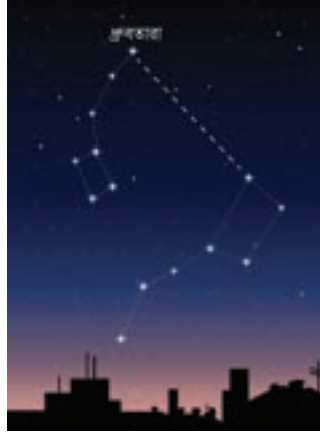
✍ আজ রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো তো, নিচের ছবি দুইটির মতো তারার বিন্যাস খুঁজে পাও কিনা!





চতুর্থ সেশন

- ✎ আগের দিনে যে তারার বিন্যাসের ছবি দেয়া হয়েছিল তা কি খুঁজে পেয়েছিলে? ক্লাসে আর কারা কারা খুঁজে পেয়েছে? আলোচনা করে দেখো তো অন্যরা কী বলে?



ছবি: বাম দিকে থেকে কালপুরুষ, সপ্তর্ষী, ও বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী

- ✎ আকাশের অসংখ্য তারার মাঝে যে অনেক ছবি লুকিয়ে আছে কখনো লক্ষ্য করেছ? প্রাচীন মানুষেরা কিন্তু এই তারার বিন্যাস থেকে অনেক ছবি কল্পনা করেছে, অনেক পৌরাণিক কাহিনীও সৃষ্টি হয়েছে এই কাল্পনিক ছবির সূত্র ধরে। তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে এরকম বেশ কিছু ছবি দেয়া আছে। একনজর দেখে নাও!

- ✎ উপরের তিনটি ছবির সাথেই কিন্তু প্রাচীন পুরাণের দারণ কিছু গল্প জড়িয়ে আছে। তোমরাও কি এমন ছবি কল্পনা করতে পারো?

- ✎ তুমি আর তোমার পাশের সহপাঠী মিলে তারার এই বিন্যাসগুলো থেকে ছবি আর গল্প তৈরির চেষ্টা করে দেখো তো?

পুরাণের গল্পে কালপুরুষ



“কালপুরুষ ছিল বিখ্যাত এক যোদ্ধা ও শিকারী! অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ত না! সে দাবি করতো যে পৃথিবীর সকল জন্তুই সে শিকার করতে সক্ষম! তার এত অহংকারে দেবতারা ক্ষুব্ধ হলেন। তারা একটা বৃশ্চিক বা কাঁকড়াবিছা পাঠালেন

কালপুরুষকে শাস্তা করার জন্য। সেই বিছার কামড়েই মৃত্যু হলো কালপুরুষের! দেবতারা পৃথিবীর মানুষকে অহংকারের পরিণাম দেখানোর জন্য কালপুরুষ আর বৃশ্চিক দুজনকেই আকাশে স্থান দিলেন, যাতে আকাশে তাকালেই মানুষের এই শিক্ষা মনে পড়ে যায়! তাই রাতের আকাশে আজও সেই বৃশ্চিক তার শিকার কালপুরুষকে তাড়া করে বেড়ায়!”

অন্যদের ছবি আর গল্পের সাথে নিজেদেরটা মিলিয়ে দেখো, তোমার শিক্ষককেও দেখাও।



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

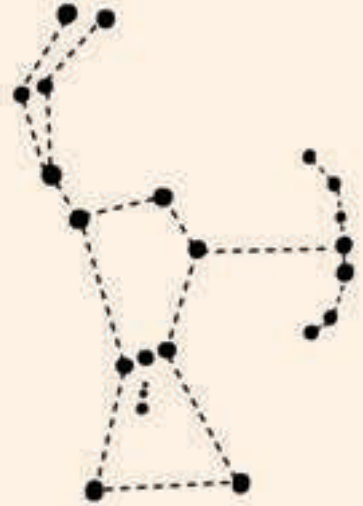
.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



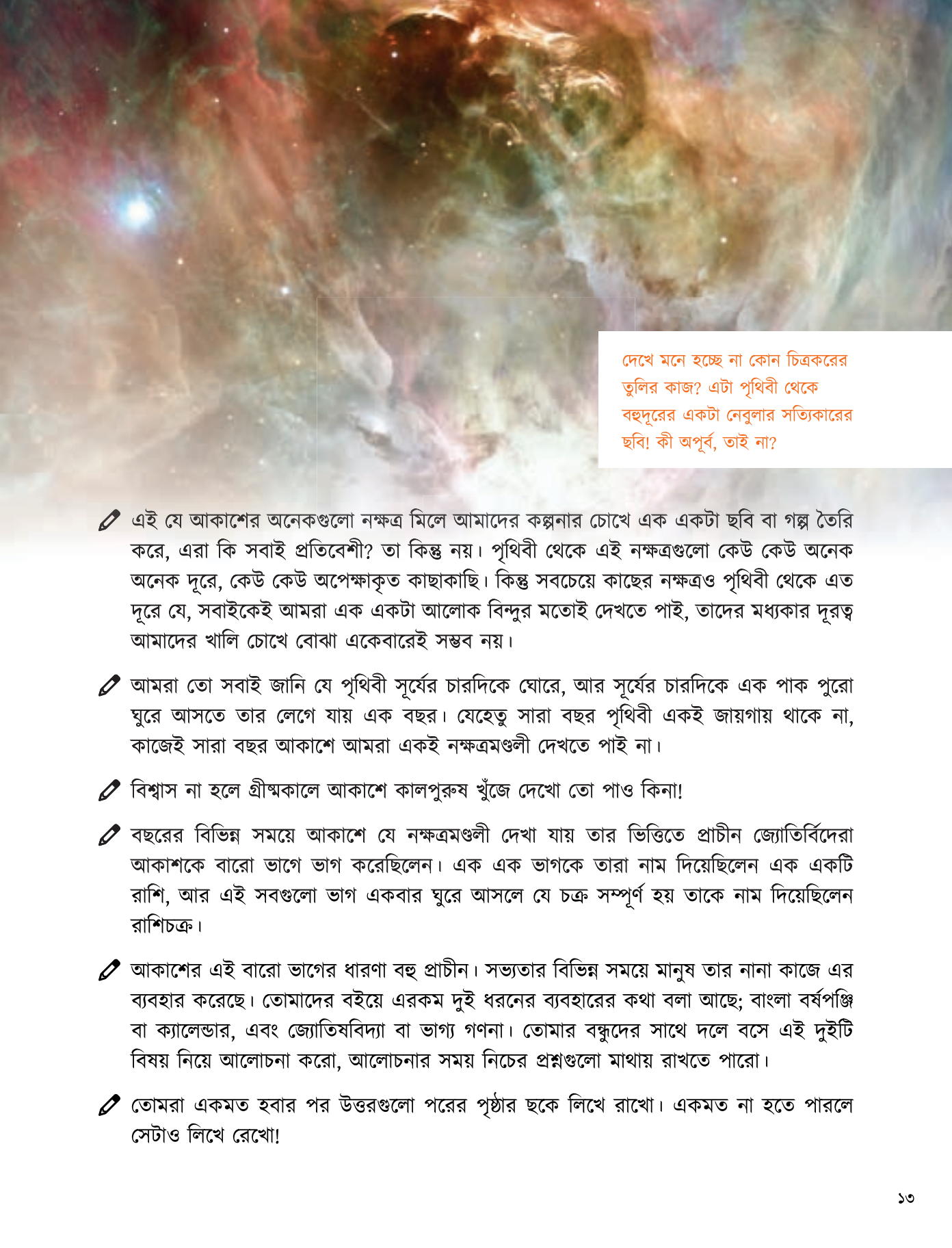
.....

.....

.....

.....

.....



দেখে মনে হচ্ছে না কোন চিত্রকরের
তুলির কাজ? এটা পৃথিবী থেকে
বহুদূরের একটা নেবুলার সত্যিকারের
ছবি! কী অপূর্ব, তাই না?

- ✍ এই যে আকাশের অনেকগুলো নক্ষত্র মিলে আমাদের কল্পনার চোখে এক একটা ছবি বা গল্প তৈরি করে, এরা কি সবাই প্রতিবেশী? তা কিন্তু নয়। পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রগুলো কেউ কেউ অনেক অনেক দূরে, কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি। কিন্তু সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রও পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, সবাইকেই আমরা এক একটা আলোক বিন্দুর মতোই দেখতে পাই, তাদের মধ্যকার দূরত্ব আমাদের খালি চোখে বোঝা একেবারেই সম্ভব নয়।
- ✍ আমরা তো সবাই জানি যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আর সূর্যের চারদিকে এক পাক পুরো ঘুরে আসতে তার লেগে যায় এক বছর। যেহেতু সারা বছর পৃথিবী একই জায়গায় থাকে না, কাজেই সারা বছর আকাশে আমরা একই নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে পাই না।
- ✍ বিশ্বাস না হলে গ্রীষ্মকালে আকাশে কালপুরুষ খুঁজে দেখো তো পাও কিনা!
- ✍ বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দেখা যায় তার ভিত্তিতে প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা আকাশকে বারো ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক এক ভাগকে তারা নাম দিয়েছিলেন এক একটি রাশি, আর এই সবগুলো ভাগ একবার ঘুরে আসলে যে চক্র সম্পূর্ণ হয় তাকে নাম দিয়েছিলেন রাশিচক্র।
- ✍ আকাশের এই বারো ভাগের ধারণা বহু প্রাচীন। সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে মানুষ তার নানা কাজে এর ব্যবহার করেছে। তোমাদের বইয়ে এরকম দুই ধরনের ব্যবহারের কথা বলা আছে; বাংলা বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার, এবং জ্যোতিষবিদ্যা বা ভাগ্য গণনা। তোমার বন্ধুদের সাথে দলে বসে এই দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করো, আলোচনার সময় নিচের প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে পারো।
- ✍ তোমরা একমত হবার পর উত্তরগুলো পরের পৃষ্ঠার ছকে লিখে রাখো। একমত না হতে পারলে সেটাও লিখে রেখো!

	বাংলা বর্ষপঞ্জি	জ্যোতিষবিদ্যা বা ভাগ্য গণনা
কীভাবে এল?		
কী কাজে ব্যবহার করা হয়?		
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা?		



পঞ্চম সেশন

✍ আগের দিনের আলোচনা থেকে তোমরা কি কোনো অবৈজ্ঞানিক চর্চা বা কুসংস্কার শনাক্ত করতে পেরেছো? তোমাদের পরিবার কিংবা আশেপাশের মানুষদের মাঝে এমন কাউকে দেখেছো যারা এই ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন? এসব ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কী হওয়া উচিত? বন্ধুরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও এবং পরের পৃষ্ঠার ছকে লিখ। দলীয় মতামত শিক্ষকসহ ক্লাসে বাকিদের সাথেও শেয়ার করো, দেখো অন্য দলগুলো তোমাদের সাথে একমত হয় কিনা।

প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক চর্চা বা কুসংস্কার		
তোমার দায়িত্ব কী হওয়া উচিত?		

- ✍ ‘আকাশ কত বড়’ সে বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, ভেবেছি, জেনেছি। কাগজে কলমে আকাশ দেখার কাজ এবারের মতো শেষ, কিন্তু তোমার আকাশ দেখায় কিন্তু কোনো বাধা নেই!
- ✍ শেষ করার আগে নিচের ছকে নিজের চিন্তাটা টুকে রাখো তাহলে এবার। বাম দিকের প্রশ্নগুলো একটু ভেবে ডান পাশে তোমার উত্তরটুকু বসিয়ে দাও-

আকাশের দিকে তাকালে এখন নতুন কী কী চোখে পড়ছে, বা নতুন কী চিন্তা মাথায় আসছে?	
এই বিষয়ে আর কী কী প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে?	

নিশ্চয়ই তোমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনো বাকি? সেই উত্তরগুলোও তোমরা একসময় খুঁজে পাবে, হয়ত উপরের কোনো ক্লাসে। সেটা যদি নাও হয়, তুমি নিজে নিজেই অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে পারো, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে কীভাবে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবে তা তো এখন তোমাদের সবার জানা! আর স্কুলের বইয়ের বাইরেও পৃথিবীতে হাজার হাজার বই তো রয়েছেই!